بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

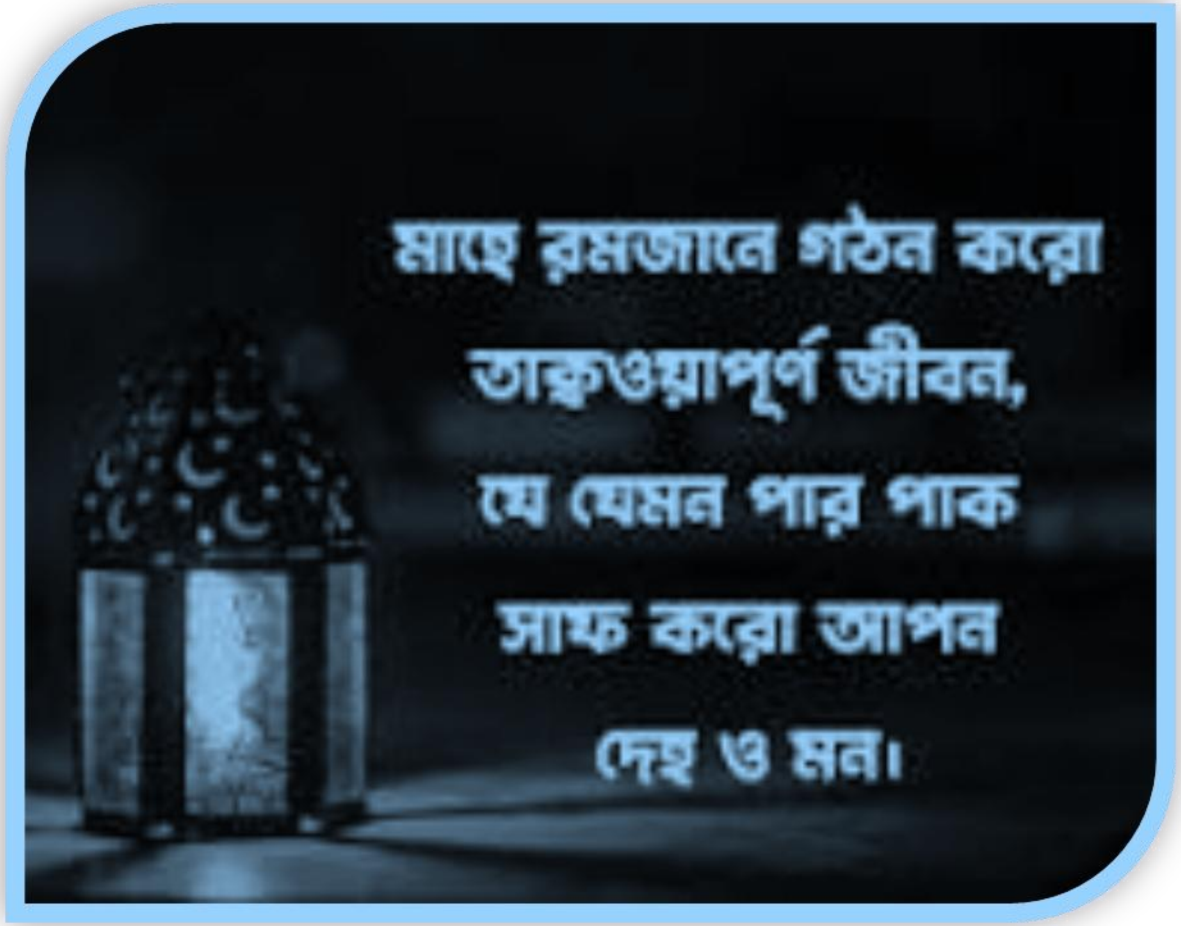
মাহে রমজানে গঠন করো
তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন,
যে যেমন পার পাক
সাফ করো আপন
দেহ ও মন।

“আমার রমাদান কেমন হবে”-

২য় পর্ব

তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ২:১৮৩

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববতীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো।

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ ২:১৮৪
وَ اَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে। সূরা বাকারাঃ ১৮৪

صوم এর শব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ‘সাওম’। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়াতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে।
সাওমের যে মূল ফায়দা তা হলো তাকওয়া অর্জন। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই তাকওয়ার ভিত্তি।
তাকওয়ার মূল ধাতুর অর্থ বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি।
তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল ভয় করা, পরহেযগারী, বিরত থাকা।
মূলত তাকওয়া শুধু আল্লাহভীতি নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে সেই রকম সচেতনতা(যা তাঁর আসমা ওয়াস সিফাতকে জানা বুঝা ও নিজ জীবনে প্রতিফলন করা)) রাখা, যার ফলে গুনাহ থেকে সরে থাকা ও কল্যান কাজে লিপ্ত থাকা যায়, মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন তার অনুসরন(রাসুল সা এর আদর্শ) করা।
শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ তা’লার সকল আদেশ মানা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

তাকওয়ার পরিচয় জানার আগে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রথমে দেখে নিই-

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে-

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তিন ব্যক্তির একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরের নিকট আসলো। যখন তাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো, যেন তাঁদের কাছে তা কম মনে হলো, আর বললো, “আমরা কোথায় আর নবীজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোথায়? তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” তখন একজন বললো, “আমি সব সময় রাতভর নামায পড়তে থাকবো।” অপর একজন বললো, “আমি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখতে থাকবো, রোযা ভাঙ্গবো না।” অপর একজন বললো, “আমি নারীদের থেকে দূরে থাকবো, কখনো বিয়ে করবো না।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন এবং বললেন, “তোমরাই এসব এসব কথা বলেছ? সাবধান! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। অথচ আমি রোযা রাখি এবং ভাঙ্গি। (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই এবং বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।” [সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমি তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী।

সুতরাং হাদীস থেকে বুঝা গেল, অধিক ইবাদতের নাম তাকওয়া নয়, নিজের আবেগ মতো ইবাদত করার নাম তাকওয়া নয়। বরং আল্লাহর মানশা ও সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল করার নাম তাকওয়া। আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে নিজেকে ন্যস্ত করার নাম তাকওয়া। আল্লাহর মানশা ও মর্জির সামনে আত্মসমর্পণ করার নাম তাকওয়া।

বান্দা আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে নিজেকে কতটুকু ন্যস্ত করে, আল্লাহ মূলত এটাই দেখতে চান। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন--

তুমি যে কিবলার উপর ছিলে, তাকে আমি কিবলা বানিয়েছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, আমি দেখতে চাই, কে রাসূলকে অনুসরণ করে? আর কে তার পিছন দিকে ফিরে যায়। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত কঠিন, তবে তাদের জন্য (কঠিন) নয়, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন...।” [সূরা বাকারা ০২: ১৪৩]

১৬/১৭ মাসের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে আল্লাহ দেখতে চাইলেন, তারা আবেগ থেকে সরে এসে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে পারছে কিনা? অনেক সময়ই আমরা আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদের আবেগ ও যুক্তিকে জায়গা দিয়ে ফেলি। মূলত এসব আবেগ আর যুক্তিকে দূর করাই এই কিবলা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। নিজের আবেগ ও যুক্তিকে দূরে ঠেলে দিয়ে যারা আত্মসমর্পণ করতে পারে তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত আয়াতে হেদায়াতপ্রাপ্ত বলেছেন।

আর যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তারাই তাকওয়ার অধিকারী হয়। তাই তো সূরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীনদের গুণগুলো উল্লেখ করার পর বলছেন-

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এরাই সফলকাম।” [সূরা বাকারা:০৫]

সুতরাং আমরা একটি উপসংহারে আসতে পারি-

তাকওয়া হলো, আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করার নাম। আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে বিনা সংকোচে মেনে নেয়ার নাম।

আত্মসমর্পণ ও তাকওয়ার মধ্যকার সম্পর্ক

আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করাকে আরবীতে ‘ইসলাম’ বলে। আর যারা আত্মসমর্পণ করতে পারে, তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হেদায়াত পেয়ে গেল…..” [সূরা আলে-ইমরান, ০৩:২০]

উপরে আমরা দেখেছি, যাদের মাঝে তাকওয়ার গুণাবলি আছে তাদেরকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। একইভাবে এখানেও বলা হচ্ছে, যাদের মাঝে ইসলাম রয়েছে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। সুতরাং বুঝা গেল, তাকওয়া ও আত্মসমর্পণ একসূত্রে গাঁথা।

তবে উভয়ের মাঝে অল্প পার্থক্য এটা করা যায়,

ইসলাম হলো, শরীয়তের বিধানের সামনে আত্মসমর্পণের বাহ্যিক অবস্থা। আর তাকওয়া হলো, আত্মসমর্পণের আত্মিক অবস্থা (হালাত)। এ কারণেই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেছেন, التقوى ههنا তাকওয়া এখানে)

আত্মসমর্পণের এক অনুপম দৃষ্টান্ত

‘আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম’ এ কথাটি নিচের হাদীসে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে-

মক্কা বিজয়ের পর পর হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফের যুদ্ধ হয়। তায়েফের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মূল ফটক বন্ধ করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, দুর্গের ভেতর থেকে যে কোনো গোলাম বের হয়ে ইসলাম কবুল করবে, তাকে আযাদ করে দেয়া হবে। তখন ২৩ জন গোলাম বের হয়ে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে একজনের ঘটনা হাদীসের কিতাবগুলোতে এসেছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের সাথে লড়াই করছিলেন। তখন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক ব্যক্তি আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ইসলাম পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং বললো, (এখন) সর্বোত্তম আমল কোনটি; যাতে আমি করতে পারি...?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাদের থেকে এসেছ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তখন সে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে অল্প আমল করলো; কিন্তু বিরাট প্রতিদান পেল।” [মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালিসী, হাদীস নং ৭৬০] হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও এসেছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, ওই ব্যক্তি যিনি জিহাদে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন, বাহ্যত তার আমলনামায় কোনো নামায নেই, রোযা নেই। কিন্তু যেটি আছে তা হলো, আল্লাহর যখন যে হুকুম, সে হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করা। এর নামই ইসলাম।

নিচের আয়াতে তাকওয়া ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্ট-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ} -آل عمران: 102

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর। এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” -সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১০২

আয়াত থেকে বুঝা যায়, যথাযথ তাকওয়া হলো, আল্লাহর বিধানের সামনে মনেপ্রাণে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ এ কথা অন্তরে চলে আসা যে, আল্লাহর যেকোনো বিধান আমার সামনে আসবে, আমি তা আদায়ের জন্য শতভাগ প্রস্তুত।

অন্তরের এ হালাত নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেই বুঝা যাবে আমি যথাযথ তাকওয়ার উপর মৃত্যুবরণ করতে পেরেছি।

তাকওয়ার বিষয়টি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে শায়খ আবু ইমরান হাফিযাহুল্লাহর একটি আলোচনা খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। শায়খ তাকওয়ার তিনটি স্তর বলেছেন। তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর

তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ হলো- বাঁচানো, রক্ষা করা, হেফাযত করা। এ অর্থটি মাথায় থাকলে স্তরগুলোতে তাকওয়ার অর্থ কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা স্পষ্ট হবে।

প্রথম স্তর: ঈমান আনার মাধ্যমে তাকওয়া। কেউ যখন ঈমান আনে, এর বদৌলতে সে তাকওয়ার ন্যূনতম পর্যায়টি অর্জন করে। এর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে চির জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচায়। এর নিচে তাকওয়ার কোনো স্তর নেই।

দ্বিতীয় স্তর: এর চেয়ে উপরের স্তর হলো, বান্দা তার উপর অর্পিত যত ফরয আছে সব আদায় করে এবং সকল হারাম থেকে বিরত থাকে। কারো মাঝে যদি এ পর্যায়ের তাকওয়া অর্জন হয়ে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, সে জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তাকে এক মুহূর্তের জন্যও জাহান্নামে যেতে হবে না ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় স্তর: এর চেয়েও উপরের স্তর হলো, (ঈমান আনা, ফরয ইবাদত পালন ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি) এমন মুবাহ কাজ থেকেও বিরত থাকা, যেগুলো আখিরাতের যাত্রাপথে তার জন্য নিষ্প্রয়োজন।

এ স্তরটি অনেক বিস্তৃত। এ স্তরে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী জান্নাতে নিজের পর্যায় উন্নীত করে।) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যার যার আমল অনুযায়ী বহু বহু স্তর। এ স্তরে ব্যক্তি তার তাকওয়া ও আনুগত্যের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে শুধু নিজেকে বাঁচায়ই না, বরং জান্নাতে তার মর্যাদা অনেক অনেক উঁচু করতে সমর্থ হয়। এমন ব্যক্তি আখিরাতের যাত্রা পথে নিষ্প্রয়োজন মুবাহ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে। ফারায়েয ও ওয়াজিবাত আদায়ের পাশাপাশি আখিরাতের যাত্রা পথে সহায়ক নফল ইবাদতে প্রচুর পরিমাণে নিজেকে আটকে রাখতে সমর্থ হয়।

রমযান ও তাকওয়া

মূলত এই তৃতীয় স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানের দৌলত নসীব করেছেন। একটু লক্ষ করুন:

রমযানে রোযার মধ্যে আমাদের প্রশিক্ষণটা কী ধরনের হয়?

এ মাসে মুবাহ-বৈধ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। রোযার মধ্যে তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। আহার করা, পান করা, স্ত্রী সহবাস করা। এগুলোর যেকোনো একটি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। অথচ দেখুন, এগুলো স্বাভাবিক সময়ে মুবাহ-বৈধ ছিল। কিন্তু রমযানে ৩০টি রোযার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর হুকুমের সামনে এমনভাবে আনুগত্য দেখাতে হয় যে, এই বৈধ জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকতে হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বান্দা নিজের উপর সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। ফলে তার জন্য আল্লাহর চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা সহজ হয়ে যায়।

এ মাসে স্বাভাবিক মুবাহ কাজগুলো থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্যতার এমন স্তরে নিয়ে যেতে চান, যেন যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো স্থানে আমরা নির্দ্বিধায় আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

বিষয়টি এমন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পেলে একটি স্বাভাবিক বৈধ জিনিসও ছেড়ে দিতে পারে, তার জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে অন্যায়-অপরাধ ছেড়ে দেওয়া বা কোনো বিধানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া তো মামুলি বিষয়। রমযানের মাধ্যমে আল্লাহ মূলত তাঁর বান্দাকে এমন বানাতে চান।

এখন কেউ যদি রমযানে তাকওয়ার তৃতীয় স্তরের প্রশিক্ষণ নিতে এসে তাকওয়ার দ্বিতীয় স্তরকেই ভাঙ্গতে থাকে, যেমন- মিথ্যা বলতে থাকে, গীবত করতে থাকে, ঝগড়া করতে থাকে, নামায ছাড়তে থাকে, হারামে লিপ্ত হতে থাকে এবং ফরয-ওয়াজিব ছাড়তে থাকে; তাহলে এমন ব্যক্তি তাকওয়ার তৃতীয় স্তরের প্রশিক্ষণ নিয়ে কী করবে?

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং এর উপর আমল ছাড়তে পারলো না, এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রতি আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।” -সহীহ বুখারী: ১৯০৩

অনেক তাহাজ্জুদ গুজার এমন রয়েছে, যার ভাগে রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই নেই। আবার অনেক রোযাদার এমন রয়েছে, যার ভাগে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই নেই।” -সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬৯০; সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৯৯৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।” -[মুসনাদে আহমদ: ২২০৫১; জামে তিরমিযী: ২৬১৬]

ইসলামের চূড়া তথা জিহাদের আমলে পৌঁছতে হলে, ইসলামের প্রতিটি স্তর বা আনুগত্যের প্রতিটি স্তর ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হবে। কিছু বাদ দিয়ে দিয়ে আমরা চূড়ায় পৌঁছতে পারবো না, বরং পা ফসকে একদম নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ হেফাযত করুন।

, জিহাদ সহজ কোনো আমল নয়। বরং এমন একটি আমল যেখানে আল্লাহর বিধানের সামনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করতে হয়। নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে হয়। তাই এই স্তরে উঠা সহজ কাজ নয়। বরং যারা পুরো পাহাড় ধীরে ধীরে অতিক্রম করেছে, তাদের জন্যই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করা সহজ।

আল্লাহর প্রতিটি বিধানের সামনে সঠিকভাবে আত্মসমর্পণ না করে চূড়ায় আরোহণ করতে চাওয়া মানে মাঝে ফাঁকা রেখে রেখে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করা। এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পদস্খলন হবেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

*

একটু লক্ষ করুন, ইসলামের দুটি বিজয় ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়; হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী বিজয়। বদর ও ফাতহে মক্কা।

মূলত সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে নিয়ে এ দুটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আল্লাহর সামনে নিজেদের সবচেয়ে বড় আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। রমযান মূলত আল্লাহ এ উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুটি যুদ্ধে আল্লাহর সামনে শ্রেষ্ঠ আনুগত্য পেশ করলেন। রমযান যেমনিভাবে কুরআনের মাস, একইভাবে জিহাদেরও মাস।

এই আনুগত্য কী পর্যায়ের কাম্য তা অনুধাবন করতে এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট-

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি ‘কুরাউল গামীম’ নামক স্থানে আসলেন, রাসূলকে বলা হলো, লোকদের জন্য রোযা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। সবাই আপনি কী করেন সে অপেক্ষায় আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর একটি পানি ভর্তি পাত্র আনতে বললেন। অতঃপর পাত্রটি উঁচু করে ধরে পানি পান করলেন, যাতে সবাই দেখে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো, কেউ কেউ (কষ্ট করেই) রোযা রেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তারাই হলো অবাধ্য। তারাই হলো অবাধ্য।” [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৪]

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ। আনুগত্য কীসের নাম!

আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ কীসের নাম, তা এ হাদীসে অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বিপরীত হওয়ায় স্বয়ং রমযান মাসে রোযা রেখেও অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে।

এখানে মূল বিষয় এটাই, আবেগের নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তাঁদের হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণের নামই হলো ইসলাম।

হাদীস থেকে বুঝা যায়, জিহাদ আবেগ দিয়ে হয় না, বরং আনুগত্য দিয়ে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা ও কৃপনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে তারাই সফলকাম হবে। সূরা আত তাগাবুন: ১৬

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের মধ্যে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। সূরা আল হুজুরাত: ১৩

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴿
আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফ্‌সকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত। সূরা আন নাযিয়াত: ৩৫-৪১

আর তাই মহান আল্লাহ ঈমানদের সম্বোধন করে আহবান করেছেন:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। সূরা আলে ইমরান: ১০২

তাকওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার শক্তি জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ৮:২৯

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। সূরা আনফালঃ ২৯

’’অর্থাৎ তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠ বিচার-বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়। তাই সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ চিনতে এবং তা অনুধাবন করতে ভূল করে না।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ৫৭:২৮

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা হাদীদঃ ২৮

তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।” [সূরা বাকারা ০২: ১৮৩]

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

রমযানে রোযা রাখার মাধ্যমে তাকওয়ার অনুশীলন হয়। তবে অনুশীলন করার মানেই মুত্তাকী হয়ে যাওয়া নয়। যেমন ইফতা পড়া মানেই মুফতী হয়ে যাওয়া নয়। ডাক্তারি পড়া মানেই ডাক্তার হয়ে যাওয়া নয়। বরং যার মধ্যে একটা স্থিতিশীল স্থির যোগ্যতা তৈরি হয়, সেই মুফতী হয়, ডাক্তার হয়। অনুরূপ তাকওয়ার বিষয়টিও। আপনি এক দুদিন কষ্ট করে ফেললেই তাকওয়া অর্জিত হয়ে যাবে না। বরং তাকওয়ার সিফাতগুলোকে নিজের ভেতরে স্থির করে ফেলতে হবে।

সেই সিফাতগুলো কি?

“আলিফ লাম মীম। এটি এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। (মুত্তাকী তারা) যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখে এবং তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তাঁরা অপন রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁরাই সফলকাম।” [সূরা বাকারা, ০২:০১-০৫]

প্রাপ্ত গুণগুলো হলো- অদৃশ্যের প্রতি ঈমান,সালাত কায়েম করা, নিজের যা আছে তা থেকেই দান করা, কুরআনের প্রতি ঈমান, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান,আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

ঈমান ও ইয়াকীন উভয়টির অর্থই ‘বিশ্বাস’। তবে ইয়াকীন হলো ‘দৃঢ় বিশ্বাস’। এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব সময় মাথায় কাজ করে, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন হচ্ছে এটাই। সুতরাং মুত্তাকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো, আখিরাতকে সবসময় মাথায় রাখা।

ইবলিশ আমাদের শেখায় দুনিয়াকে সব সময় মাথায় রাখো,আখেরাত পরে দেখা যাবে- ভেবে দেখার বিষয়

পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে। বরং পুণ্য হলো, কোনো ব্যক্তি সে ঈমান রাখলো আল্লাহর প্রতি, শেষদিন ও ফেরেশতাদের প্রতি এবং আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং সওয়ালকারীদেরকে এবং দাস মুক্তিতে। আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং যারা কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে। আর যারা সংকটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা যারা জীবনকে সত্য করে দেখিয়েছে এবং এরাই মুত্তাকী। [সূরা বাকারা, ০২:১৭৭]

"এবং নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা ঐসব লোক যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা নিজেদের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আর আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন। আর তারা যখন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলে, (তখনি) আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তারা তাদের গুনাহের কারণে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনে শুনে তাদের (মন্দ) কর্মে অবিচল থাকে না।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৩-১৩৫]

লক্ষ করে দেখুন, মুত্তাকীদের অনেকগুলো সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এক জায়গায়ও এ কথা বলা হয়নি যে, সিয়াম পালন করা মুত্তাকীদের সিফাত। কারণ সিয়াম তো হলো, তাকওয়া অর্জনের বিশেষ কোর্স। তাই সিয়াম পালনকে আলাদাভাবে সিফাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

সিয়াম পালন মানে মুত্তাকী হয়ে যাওয়া নয়। বরং সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়ার কোর্স করা হয়ে থাকে। মুত্তাকী হতে হলে কী কী গুণ লাগবে এগুলো তো আমরা উপরের তিনটি আয়াতে বেশ সমৃদ্ধভাবে পেয়েই গেছি। এর অর্থ হলো, সিয়াম পালন কালে আমরা তাকওয়ার কোর্সে ওই সিফাতগুলো অর্জন হচ্ছে কিনা সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

প্রথম কথা হলো, যখন আমাদের রমযান শুরু হয়ে যাবে তখন সিয়াম পালনকালে আমাদের মধ্যে উপর্যুক্ত গুণগুলো স্থিরভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা এই ফিকির রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা দুর্বল। সবসময়ই দুর্বল। তাই রমযান আসার পর থেকে যদি ফিকির শুরু করি তাহলে শুরু করতে করতে রমযান হয়তো আমাদের থেকে বিদায় নিবে। আল্লাহ হেফাযত করুন।

রমযানের আগেই রমযানের প্রস্তুতি নিবো কেন?

“বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া। কিছু সময় ব্যয় করবে তার আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থনায়, কিছু সময় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করা, কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য, আর কিছ সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।—(ইবনে হিব্বন)”

“যে ব্যক্তি ভালোকাজের পরিকল্পনা করল, কিন্তু বাস্তবে সে কাজ করতে পারল না, সে ব্যক্তির জন্য সাওয়াব লেখা হবে।” মুসলিম, হাদিস নং- ৩৫৪

পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে তার একটি সুন্দর ফলাফল লাভ করা যায়, কাজটি সহজ, সুন্দর ও সুচারুরূপে কাজ সম্পাদন করা যায় এবং সর্বোচ্চ ফায়েদা অর্জন করা যায়।

বান্দার উপর তার হায়াতের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর তরফ থেকে নেয়ামত। যখন বান্দা এ নেয়ামতের শোকর আদায় করে, আল্লাহ নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন, বান্দাকে আরও তাওফীক দান করেন।

لَئِن شكرتم لأزيدنكم. –إبراهيم: 7

“যদি তোমরা শোকর আদায় কর, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিব।” -সূরা ইবরাহীম ১৪:০৭

আমরা সবাই ভুলে গেলেও আল্লাহ ভুলেন না। আপনি আল্লাহর দেওয়া ছোট থেকে ছোট নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবেন, আর সেটা আল্লাহর নজর থেকে ছুটে যাবে বা আল্লাহ সে শুকরিয়ার মূল্যায়ন করবেন না; তা কখনোই হতে পারে না। আল্লাহ এর থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. –الدهر: 22

“তোমাদের চেষ্টাগুলো সবসময় মূল্যায়িত হয়” -সূরা দাহর ৭৬: ২২

(كَانَ এই শব্দটিই বলে দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। সবসময় এমনই হয়ে আসছে।

আল্লাহ যখন দেখবেন বান্দা রমযানের আগেই সময়গুলোর কদর করছে, বেশি বেশি ইবাদতের চেষ্টা করছে, মুত্তাকীদের গুণগুলো অর্জনের চেষ্টা করছে; তখন রমযানে আল্লাহ তাকে আরও নেয়ামত বাড়িয়ে দিবেন, নেক আমলের আরও বেশি তাওফীক দান করবেন, তাকওয়ার গুণগুলো তাকে দিয়েই দিবেন ইনশাআল্লাহ।

তাছাড়া পুরোটা বছর আমরা কত কত গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি। জানা-অজানা নানা গুনাহে লিপ্ত হই। সুতরাং পুরো ১১ মাসের মন্দ আমল ও বাজে অভ্যাসগুলো যদি কোনো বাধা ছাড়াই রমযানে প্রবেশ করে তাহলে রমযানে এসে সেগুলোতে ব্রেক দিতে দিতে রমযানের বেশিরভাগ সময় চলে যাবে; রমযান থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই আমার মন্দ আমল এবং বাজে অভ্যাসগুলো যেন রমযানের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় না ফেলতে পারে, এর জন্য আগে থেকে ব্রেক দিতে হবে।

রমযানের পূর্বেই আমরা যেসব প্রস্তুতি নেব, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রস্তুতি হলো-

১। তাওবার মাধ্যমে রমযানের পূর্বেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসাঃ

আয়োজন যত বড় ধরনের হয়, তার প্রস্তুতি তত আগে থেকে শুরু হয়। কোনো আয়োজনের প্রস্তুতি যদি মূল আয়োজনের দিন থেকে শুরু হয়, বুঝতে হবে সে আয়োজন হয় খুবই ছোট অথবা আয়োজকদের কাছে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নয়। আয়োজন কতটা গোছানো ও সুন্দর হবে তা নির্ধারণ করা হবে, এর জন্য প্রস্তুতি কী ধরনের নেওয়া হয়েছে তারই আলোকে।

আমরা তো ঊর্ধ্বজগতের বিষয়গুলো দেখি না। যদি দেখার সুযোগ থাকতো তাহলে হয়তো রমযানকে কেন্দ্র করে ফেরেশতাদের অনেক ছুটাছুটি আমরা দেখতে পেতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তাআলা বনি আদমের প্রতিটি নেক আমলের বদলা দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত দান করেন। তবে রোযার বিষয়টি ভিন্ন। (কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,) রোযা আমার। তাই এর প্রতিদান আমি (নিজে) দিব। রোযাদার ব্যক্তির দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময়। অপরটি কিয়ামতের দিন (রবের সাক্ষাতের সময়)। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।” [মুসনাদে আহমদ: ৪২৫৬]

সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর সাথে এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিরাট মাধ্যম। সুতরাং এখানে এসে যদি আল্লাহ চেয়ে থাকেন বান্দার দিকে, আর বান্দা চেয়ে থাকে আরেকজনের দিকে; তাহলে সেই সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হবে? তাই অন্যের দিকে না তাকিয়ে সিয়াম পালন করতে হবে শুধুই আল্লাহর হুকুমের দিকে তাকিয়ে। আর এটাই হলো, ইহতিসাব।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“এবং নিজ রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য।তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ০৩: ১৩৩

আয়াতে যেহেতু বলা হয়েছে (سَارِعُوا) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ক্ষমার দিকে ছুটে আসো, বুঝা যাচ্ছে, তোমরা ক্ষমার দিকে ছুটলে, ক্ষমাও তোমাদের দিকে ছুটে আসবে। (سَارِعُوا) শব্দটি যেহেতু বাবে মুফাআলা থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এখানে ছুটে আসা উভয়পক্ষ থেকেই হবে। বাবে মুফাআলার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, দুই পক্ষ থেকেই কাজটি পাওয়া যাওয়া।

“বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক বা’ باع পরিমাণ (সোজা দাঁড়িয়ে দুহাত দুদিকে প্রসারিত করলে যেটুকু হয়) অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।” -সহীহ বুখারী: ৭৫৩৬; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫

আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় আমল—গুনাহের পর ফিরে আসা

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) –آل عمران: 135

“এবং তারা যখন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেলে, (তখনি) আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তারা তাদের গুনাহের কারণে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের (মন্দ) কর্মে অবিচল থাকে না।” -সূরা আলে-ইমরান ০৩: ১৩৫

মানুষ দুর্বল। সে ভুল করবেই। কিন্তু ভুল করে গো ধরে বসে থাকাটা দূষণীয়।

আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মুত্তাকী ব্যক্তিও গুনাহ করে ফেলতে পারে। এটা তাকওয়া পরিপন্থি নয়; যখন বান্দা সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে।

হ্যাঁ, তাকওয়ার পরিপন্থি হলো, গুনাহের পর ফিরে না আসা। ক্ষমা না চাওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে হটিয়ে এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন, যারা গুনাহ করবে। অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তিনি ক্ষমা করে দিবেন।” -সহীহ মুসলিম: ২৭৪৯

বান্দা যে বান্দা, এটা তার গুনাহের পর অনুতপ্ত হওয়ার দ্বারা খুব বেশি ফুটে উঠে। তখন তার অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহর কাছে অনেক অনেক পছন্দের হয়।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ – الزمر:53

বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে; আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” - সূরা যুমার ৩৯: ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন রমযান শুরু হয় রহমতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের জিঞ্জির পড়িয়ে দেয়া হয়।” [সহীহ মুসলিম: ১০৭৯]

আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করি সেক্ষেত্রেও এমন একটি দোয়া আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেখানে রহমতের সব দরজা খুলে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। ((اللهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

তবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রমযানের বাইরে স্থানের সাথে খাস থাকে। পক্ষান্তরে রমযানে কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট না থেকে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং রমযানের পুরো ত্রিশ দিনে বান্দা যেকোনো স্থানে অবস্থান করে রহমতের অবারিত বর্ষণে সিক্ত হতে পারে। এ কারণেই রহমতের এমন অবারিত মৌসুমেও যখন কেউ আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে না পারে, তার জন্য হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বদদোয়া করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ‘আমীন’ বলেছেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠে বলেনঃ আমীন। তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ আমীন। তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ আমীন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে তিনবার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বলেনঃ আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠতেই জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে রমযান মাস পেলো এবং তা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহর ক্ষমা হলো না। আমি বললামঃ আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে নিজ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, অথচ তারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করালো না। আমি বললামঃ আমীন। অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যার নিকট আপনার উল্লেখ হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়েনি। আমি বললামঃ আমীন।আল-আদাবুল মুফরাদ

আল্লাহ তাআলা রমযান আসার পূর্বেই আমাদেরকে পূর্ণ ক্ষমা করে দিন এবং রমযানে খুলে যাওয়া রহমতের সকল দরজা থেকে প্রতিটি মুহূর্তে রহমত অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

Sisters' Forum In Islam

- তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী
- রাসূল সা. বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সামর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত রাখে। সহীহ বুখারী: ১৭৭০

মানুষের আমলনামা মহান আল্লাহর দরবারে চারটি ধাপে উত্থাপন করা হয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক ও এককালীন তথা গোটা জীবনের আমল একসঙ্গে আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা হয়।

প্রতিদিনের আমলনামা পেশঃ (দৈনিক আমল)

সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (সহীহ মুসলিম ১৭৯) এটি হল প্রতিদিনের আমলনামা।

দিনের আগেই রাতের সব আমল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয় এবং রাতের আগেই দিনের সব আমল তাঁর কাছে উত্থিত করা হয়। এবং তার পর্দা হলো নূর (বা জ্যোতি)। (মুসলিম : ২৯৩) হাদিসবিশারদদের মতে, এই দুটি সময় হলো—ফজর ও আসরের সময়।

প্রতি সপ্তাহে দুই দিন আমলনামা পেশঃ (সাপ্তাহিক আমল)

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা মতে, রাসুল (সা.) বলেন, ‘প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তায়ালার কাছে) আমল পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা তার মুমিন বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে দুই ব্যক্তির পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তাদের ক্ষমা করা হয় না। ’ (মুসলিম: ২৫৬৫,

রাসুল (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলমানের গোনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারীর ব্যাপারে (আল্লাহ বলেন) নিজেদের মধ্যে সমঝোতার আগ পর্যন্ত এদের বাদ দাও। ’ (ইবনে মাজাহ, তারগিব)

প্রতি বছরে একবার আমলনামা পেশঃ (বাৎসরিক আমল)

শাবান হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হল এমন মাস, যে মাসে রব্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক। —মুসনাদে আহমাদ ২১৭৫৩; সুনানে নাসায়ীঃ ২৩৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাঃ ৯৮৫৮

গোটা জীবনের আমলনামাঃ

সর্বশেষ কিয়ামতের দিন বান্দার সারা জীবনের আমল মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর মানুষের আমলনামা উপস্থিত করা হবে। তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এটা তো ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এর মধ্যে আছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার রব কারো ওপর জুলুম করেন না।’ (সুরা : কাহফ : ৪৯)

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam

Sisters' Forum In Islam